সাংগঠনিক কাঠামো
Organization Structure

১০

সংগঠনের মৌলিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কার্যক্রমের কাঠামোভিত্তিক প্রকাশকে সাংগঠনিক কাঠামো বলে। অর্থাৎ, সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে সমগ্র কাজকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত, শ্রেনিভূক্ত এবং সমন্বয় করা হয়। সংগঠনে প্রতিটি কর্মীর ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ ও রক্ষা করাই হলো সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মূল কাজ। সংগঠনে প্রতিটি কর্মীর সাংগঠনিক ভূমিকা সুস্পষ্ট এবং অর্থবোধক হতে হয়। সাংগঠনিক কাঠামো প্রত্যেক কর্মীর কী কাজ, কাজ কখন করতে হবে, তাদের দায়িত্ব কী থাকবে এবং কার কাছে কে জবাবদিহি করবে তার সুস্পষ্ট বিবরণ তৈরি করে। প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাপক যখন সাংগঠনি কাঠামো তৈরি করবেন তখন তাদের ছয়টি উপাদানের দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন- কর্ম বিশেষীকরণ, বিভাগীকরণ, আদেশের শৃঙ্খল, নিয়ন্ত্রণ পরিসর, কেন্দ্রিকরণ ও বিকেন্দ্রিকরণ এবং আনুষ্ঠানিকীকরণ। ইউনিট ৮- এ আমরা কেন্দ্রিকরণ ও বিকেন্দ্রিকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ ইউনিটে আমরা সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জনের জন্য কর্ম বিশেষীকরণ, বিভাগীকরণ, আদেশের শৃঙ্খল, নিয়ন্ত্রণ পরিসর এবং আনুষ্ঠানিকীকরণ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। এছাড়াও, সমন্বয়সাধন সম্পর্কেও আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাই এ ইউনিটে এ সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৩ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১: কার্য বিশেষীকরণ
পাঠ - ২: বিভাগীকরণ
পাঠ - ৩: আদেশের শৃঙ্খল
পাঠ - ৪: নিয়ন্ত্রণ পরিসর
পাঠ - ৫: আনুষ্ঠানিকীকরণ
পাঠ - ৬: সমন্বয়সাধন

পাঠ ১০.১ কার্য বিশেষীকরণ
Work Specialization

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কার্য বিশেষীকরণ সম্পর্কে সার্বিক একটি ধারণা পাবেন।

কার্য বিশেষীকরণের ধারণা এবং উৎপত্তি
Concept and Origin of Work Specialization

হেনরি ফোর্ড (Henry Ford) ধনী এবং বিখ্যাত হয়েছিলেন অটোমোবাইলের বিন্যাসকরণ সজ্জা (Assembly line) নির্মাণের জন্য। তাঁকে এ পদ্ধতির জনকও বলা হয়। ফোর্ডে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীর কাজকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং সেই কাজগুলো তাদেরকে বারংবার করতে হতো। একজন কর্মী যদি গাড়ির ডান পাশের চাকা লাগানোর দায়িত্বে থাকতো তাহলে আরেকজন হয়তো ডান পাশের সামনের দিকের দরজা স্থাপনের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকতো। সমগ্র কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্তিকরণ ও বারবার কাজগুলোকে সম্পন্ন করার মাধ্যমে ফোর্ড কম খরচে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করেন। এক্ষেত্রে তিনি অপেক্ষাকৃত সীমিত দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীদেরও কাজে লাগাতে দ্বিধা করতেননা। নতুন এ কৌশলটি ব্যবহারের ফলে একটি গাড়ি তৈরি করতে সময় লাগতো প্রায় ১২ ঘন্টা। সময় কম লাগার পাশাপাশি গাড়ি প্রতি খরচ অনেক কমে আসে। যেমন, ১৯০৮ সালে মডেল "টি" (Model T) গাড়িটি বানাতে খরচ হতো ৮৫০ ডলার। এ্যাসেম্বলি লাইন পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে ১৯২৭ সালের দিকে খরচ দাঁড়ায় মাত্র ৩১০ ডলার।

ফোর্ড দেখিয়েছেন, কর্মীদের যদি কাজে বিশেষায়িত করা হয় তাহলে তারা আরো দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদন করতে পারবে। বর্তমান কালে একে আমরা কার্য বিশেষীকরণ অথবা শ্রম বিভাগ নামে ব্যবহার করি। যার অর্থ হচ্ছে-প্রতিষ্ঠানের সমগ্র উৎপাদন পদ্ধতিকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করে কর্মীদের মধ্যে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ বন্টন করে দেওয়া। কার্য বিশেষীকরণের সারকথা হচ্ছে, সমগ্র কাজটি একজন কর্মীর দ্বারা সম্পাদন না করে, কাজটিকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা। এর মাধ্যমে একজন কর্মীকে নির্দিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ করে গড়ে তোলা হয়।

অতীতে মানুষ তার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্যাদি উৎপাদন করত। ধীরে ধীরে মানুষ বুঝতে পারল তার একার পক্ষে সকল দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়। তখন থেকেই শুরু হয় মানুষের বিশেষ পেশা বা বৃত্তি অবলম্বন করার প্রথা। কেউ তাঁতী আবার কেউবা চাষী। শ্রম বিভাজনের সূত্রপাত এখান থেকেই। বর্তমানে শ্রম বিভাগ আরও ব্যাপক হয়েছে। বলা যায়, আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শ্রম বিভাগ। বিগত সময়ে ব্যবস্থাপকরা কার্য বিশেষীকরণকে উৎপাদন বৃদ্ধির চিরস্থায়ী উৎস বলে মনে করতেন। যদিও কার্য বিশেষীকরণ ব্যপকভাবে চর্চা করা হচ্ছেনা, কিন্তু সূচনা কাল থেকেই এ পদ্ধতি সর্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিত করেছে। অনেক সময় কার্য বিশেষীকরনের কারনে কর্মীদের মধ্যে এক ঘেয়েমী, ক্লান্তি, মানসিক চাপ, নিম্ন উৎপাদান, অনুপস্থিতির হার বেড়ে যাওয়াসহ অধিক মাত্রায় ঘুর্নায়মানতা দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে কাজের মধ্যে ভিন্নতা আনায়ন, সম্পূর্ণ কাজ করার দায়িত্ব দেওয়াসহ বিভিন্ন দলে কাজ করার সুযোগ করে দিলে এসব সমস্যা থেকে উৎরানো সম্ভব।

বর্তমান সময়ের ব্যবস্থাপকরা কার্য বিশেষীকরণকে অচলও মনে করেননা আবার উৎপাদন বৃদ্ধির চিরস্থায়ী উৎসও মনে করেননা। বরং ব্যবস্থাপকেরা মনে করেন, কিছু নির্দিষ্ট কাজে এর উপকারিতা এবং আর্থিকভাবে লাভবান হলেও এর দ্বারা বহুবিধ প্রলম্বিত সমস্যা তৈরি হয়। তদুপরি, এখনও বহু নামকরা প্রতিষ্ঠান, যেমন- ম্যাকডোনাল্ড, কার্য বিশেষীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে সুনাম অর্জন করে যাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

হেনরি ফোর্ডকে কার্য বিশেষীকরণের জনক বলা হয়ে থাকে। ফোর্ডে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীর কাজকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং সেই কাজগুলো তাদেরকে বারংবার করতে হতো। সমগ্র কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্তিকরণ ও বারবার কাজগুলোকে সম্পন্ন করার মাধ্যমে ফোর্ড কম খরচে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করেন। ফোর্ড দেখিয়েছেন, কর্মীদের যদি কাজে বিশেষায়িত করা হয় তাহলে তারা আরো দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদন করতে পারবে। বর্তমান কালে একে আমরা কার্য বিশেষীকরণ অথবা শ্রম বিভাগ নামে ব্যবহার করি। যার অর্থ হচ্ছে- প্রতিষ্ঠানের সমগ্র উৎপাদন পদ্ধতিকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করে কর্মীদের মধ্যে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ বন্টন করে দেওয়া। কার্য বিশেষীকরণের সারকথা হচ্ছে, সমগ্র কাজটি একজন কর্মীর দ্বারা সম্পাদন না করে, কাজটিকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা। এর মাধ্যমে একজন কর্মীকে নির্দিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ করে গড়ে তোলা হয়।

পাঠ ১০.২ বিভাগীকরণ
Departmentalization

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিভাগীকরণ সম্পর্কে সার্বিক ধারণা পাবেন।
- বিভাগীকরণ কেন করা হয় জানতে পারবেন।
- বিভাগীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভাগীকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সাধারণত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ (jobs) বা কার্যাবলিকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করার পূর্বে 'জব ডিজাইন' (job design)- এর কাজ সম্পন্ন করা হয়। জব ডিজাইনের মানে হলো, প্রত্যেক পদে অধিষ্ঠিত কর্মীরা কী কী পদ্ধতিতে কী কী কাজ করবে তা নির্ধারণ করে দেয়া। জব ডিজাইনের পর সংগঠিতকরণ প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ হলো জব/কাজগুলোকে যৌক্তিক উপায়ে বিভিন্ন বিভাগের আওতায় নিয়ে আসা, যা গ্রুপিং (grouping) নামে সমধিক পরিচিত। এ পর্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সঠিকভাবে কাজগুলোকে বিভক্তিকৃত করার ফলে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিকে সমন্বিত করা সহজতর হয়। কাজসমূহকে গ্রুপিং করার প্রক্রিয়া বিভাগীকরণ (departmentalization) নামে পরিচিত।

সংগঠনের কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য বিভাগীকরণ প্রয়োজন। এ পাঠে আপনি বিভাগীকরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারবেন। একজন ব্যবস্থাপককে কেন বিভাগীকরণের প্রতি গুরুত্ব দিতে হয়, তিনি বিভাগীকরণের জন্য কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন এবং বিভিন্ন পদ্ধতির কী কী সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি বিষয় এখানে আলোচনা করা হবে। এ পাঠটি আপনার ভালভাবে জানা থাকলে আপনি পরবর্তীতে আদেশের শৃংখল, নিয়ন্ত্রণ পরিসর, আনুষ্ঠানিকীকরণ ও সমন্বয়সাধন সম্পর্কিত আলোচনা সহজে বুঝতে পারবেন।

বিভাগীকরণ কী
What is Departmentalization

একটি প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে বৃহৎ ব্যবসায়িক সংগঠনে বহু প্রকারের কার্য সম্পাদিত হয়। কোনো কোনো কার্য উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত, কোনোটি পণ্য ক্রয় কিংবা বিক্রয়ের সাথে আবার কোনোটি হিসাব রক্ষণ বা আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। প্রতিষ্ঠানের কিছু কাজ আছে যেগুলোকে পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত কাজ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আবার কিছু কাজকে যোগাযোগ বা নির্দেশনা অথবা নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ হিসেবে অভিহিত করা যায়। এমনিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গনে সম্পাদিত কার্যাবলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা যায়। এ কাজগুলোকে যদি সমজাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আলাদা করে ফেলা হয়, তাহলে বেশ কয়েকটি সমজাতীয় কার্য-শ্রেণির সৃষ্টি হবে। এরপর প্রত্যেকটা কার্য-শ্রেণিকে এক একটি বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করা যায়। এভাবে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিকে সমজাতীয়তার ভিত্তিতে ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হলে পুরো প্রক্রিয়াটি বিভাগীকরণ (কেউ কেউ বিভাগীয়করণ শব্দটিও ব্যবহার করে থাকেন) নামে পরিচিত হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বিভাগীকরণ হলো একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সমজাতীয় কার্যাবলিকে আলাদা আলাদা বিভাগের আওতাধীনে আনয়ন করা হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিভাগীকরণের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। ধরুন, একটি উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার পণ্য-সামগ্রী কেনা হয়। কাচাঁমাল, যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, আসবাবপত্র, রাসায়নিক সামগ্রী, মনোহারী সামগ্রী ইত্যাদি এ প্রতিষ্ঠানের ক্রয়যোগ্য সামগ্রীর অন্তর্ভূক্ত। ধরে নেয়া যায় যে, কাচাঁমাল ও যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ/রাসায়নিক সামগ্রী উৎপাদন বিভাগে ব্যবহৃত হবে। সুতরাং এগুলো ক্রয় করবে উৎপাদন বিভাগ। আবার, আসবাবপত্র ও মনোহারী দ্রব্য সব বিভাগেই ব্যবহৃত হবে; সুতরাং এগুলো ক্রয় করবে প্রশাসন বিভাগ। অথবা এমনটিও হতে পারে যে, প্রত্যেক বিভাগই নিজের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও মনোহারী দ্রব্য নিজেরাই ক্রয় করবে। এভাবে ক্রয় করা হলে মিতব্যয়িতা অর্জন সম্ভব হবে না- প্রত্যেক বিভাগই কম পরিমাণে পণ্য ক্রয় করবে বিধায় উচ্চহারে বিক্রেতার নিকট থেকে কমিশন পাবে না; আলাদাভাবে কেনাকাটা করতে

গিয়ে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেক সময়ও নষ্ট হবে। এমতাবস্থায় যদি ক্রয় সংক্রান্ত সমস্ত কাজগুলোকে 'ক্রয় বিভাগ' নাম দিয়ে ভিন্ন একটি বিভাগের অধীনে নিয়ে আসা হয়, তাহলে প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি হবে মঙ্গলজনক। অনুরূপভাবে, বিক্রয় সংক্রান্ত কাজগুলোকে বিক্রয় বিভাগের অধীনে নিয়ে আসা যায়। এক একটি বিভাগের অধীনে একই শ্রেণির কাজগুলোকে বিন্যস্ত করাই হলো বিভাগীকরণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিভাগীকরণের কয়েকটি অনুপম সংজ্ঞাঃ

David D. Van Fleet: "The process of grouping job is called departmentalization."

Stoner and Associates: "The grouping of employees and tasks is generally referred to as, departmentalization."

Koontz and Associates: "Departmentation refers to grouping activities and people into departments."

বিভাগীকরণ কেন করা হয়

Why is Departmentalization Done

বিভাগীকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো একই শ্রেণির কাজকে একটি বিভাগের অধীনে রেখে কার্যক্রমে শৃংখলা আনয়ন করা এবং বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে দয়বদ্ধ করা। প্রত্যেকটি কাজে অধিকতর নৈপুণ্য অর্জনেও বিভাগীকরণ সহায়তা করে। বিভাগীকরণ শ্রম-বিভাজন (division of labor) নীতির বাস্তবায়ন করে; এক একটি কাজ দক্ষ বিশেষজ্ঞের উপর ন্যস্ত করা যায়। অল্প খরচে সমন্বয় সাধনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। বিভাগীকরণের মাধ্যমে গঠিত বিভাগগুলো নিজ নিজ কাজে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকে এবং স্বায়ত্তশাসনের সুবিধা ভোগ করে।

বিভাগীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি

Different Ways of Departmentalization

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভাগীকরণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিগুলোকে আমরা তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি। চিত্রে বিভাগীকরণের পদ্ধতিগুলো দেখানো হয়েছে।

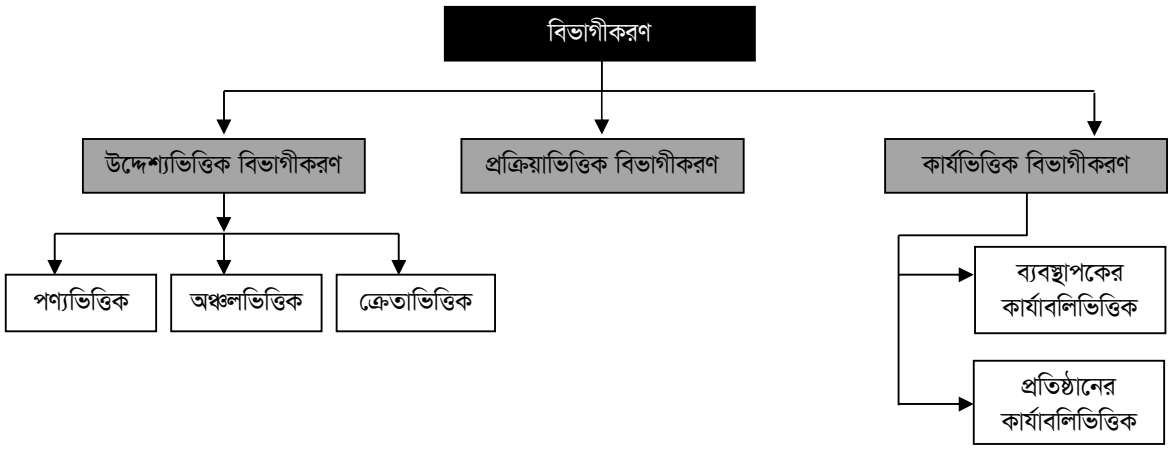

চিত্র: বিভগীকরণের শ্রেণিবিভাগ।

বিভাগীকরণ পদ্ধতিগুলোর উপর ক্রমধারা অনুযায়ী আলোচনা করা হলোঃ

১. উদ্দেশ্যভিত্তিক বিভাগীকরণ (Departmentalization by Objectives)ঃ

উদ্দেশ্যভিত্তিক বিভাগীকরণ তিন ভাবে হতে পারে- পণ্যভিত্তিক, ক্রেতাভিত্তিক এবং অঞ্চল বা স্থানভিত্তিক।

- **পণ্যভিত্তিক বিভাগীকরণ (Departmentalization by Product)ঃ** যেসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার পণ্য তৈরি করা হয় অথবা বিক্রয় করা হয়, সেখানে এক একটি পণ্যের জন্য আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন, "আলিফ লায়লা শিল্পগোষ্ঠী" ঔষধ, প্রসাধনীসামগ্রী এবং ডিটারজেন্ট পাউডার উৎপাদন করে। যেহেতু তিনটি সামগ্রীই ভিন্ন প্রকৃতির, সেহেতু কোম্পনি প্রত্যেকটি পণ্যের জন্য আলাদা বিভাগ গঠন করেছে; ঔষধ বিভাগ, প্রসাধনী বিভাগ এবং ডিটারজেন্ট বিভাগ। চিত্রটি দেখুনঃ

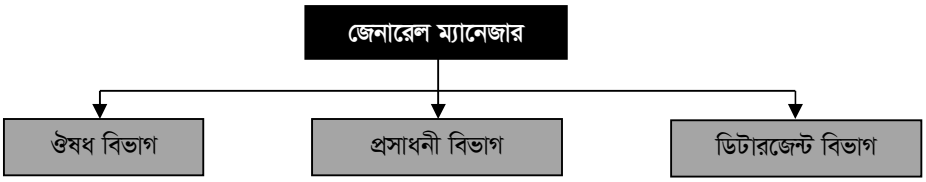

চিত্রঃ পণ্যভিত্তিক বিভাগীকরণ

- **ক্রেতাভিত্তিক বিভাগীকরণ (Departmentalization by Customer)ঃ** পণ্যও ক্রেতাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্রেতাদেরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ক্রেতাভিত্তিক বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। উৎপাদনমুখী সংগঠনে ক্রেতাদের ধরণ অনুযায়ী আলাদা বিভাগ খোলা যায়। যেমন- ডিলারদের জন্য 'ডিলার বিভাগ,' পাইকারি ক্রেতাদের জন্য 'পাইকারি বিক্রয় বিভাগ' ইত্যাদি। নিচের চিত্রটি দেখুনঃ

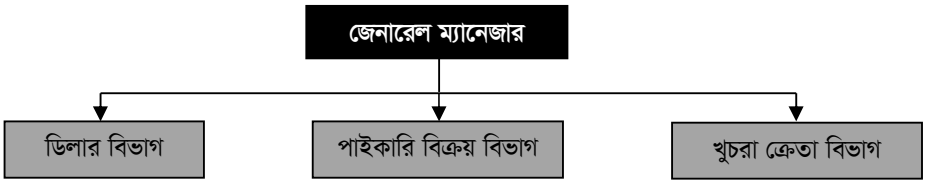

চিত্রঃ ক্রেতাভিত্তিক বিভাগীকরণ

- **অঞ্চল বা স্থানভিত্তিক বিভাগীকরণ (Departmentalization by Territory)ঃ** অঞ্চলভিত্তিক বিভাগীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় (বা সেবা) এলাকাকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক অঞ্চলকে একজন অঞ্চল-ব্যবস্থাপকের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। বিভিন্ন এলাকার জন্য বিশেষ ধরনের সেবা বা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রয়োজন হলে সাধারনত এরুপ বিভাগীকরণ করা হয়। বিভাগীকরণ জেলা বা থানাভিত্তিক হতে পারে।

চিত্রঃ অঞ্চলভিত্তিক বিভাগীকরণ

২. প্রক্রিয়াভিত্তিক বিভাগীকরণ (Departmentalization by Process)ঃ

উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করা হলে তা প্রক্রিয়াভিত্তিক বিভাগীকরণ নামে পরিচিত হয়। উদাহরণস্বরুপ, পাটকল ও বস্ত্রকলে প্রক্রিয়াভিত্তিক বিভাগীকরণ অনুসরণ করা হয়। যেসব শিল্পে কাঁচামাল কয়েকটি প্রক্রিয়া পার হয়ে চূড়ান্ত পণ্যে পরিণত হয় সেখানে প্রক্রিয়াভিত্তিক বিভাগীকরণ প্রায় অপরিহার্য।

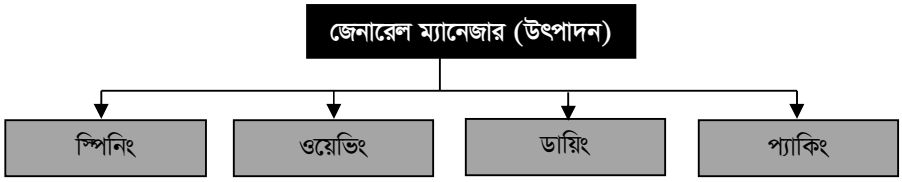

চিত্র: প্রক্রিয়াভিত্তিক বিভাগীকরণ

৩. কার্যভিত্তিক বিভাগীকরণ (Departmentalization by Functions)ঃ
প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবস্থাপকের কার্যের ভিত্তিতে কার্যভিত্তিক বিভাগীকরণকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিভিত্তিক এবং ব্যবস্থাপকের কার্যাবলিভিত্তিক।

- **প্রতিষ্ঠানের কার্যভিত্তিক বিভাগীকরণ (Departmentalization by Organizational Functions)ঃ** প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই প্রাতিষ্ঠানিক কার্যসমূহের ভিত্তিতে বিভাগীকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের জন্য, যেমন-ক্রয়, বিক্রয়, উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, হিসাবরক্ষণ, প্রশাসন, গণসংযোগ ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ খোলা হয়। প্রতিষ্ঠানের কার্যের সমজাতীয়তার ভিত্তিতে বিভাগ সৃষ্টি করা হয় বলে তাকে কার্যভিত্তিক বিভাগীকরণ বলে। চিত্রটি দেখুনঃ

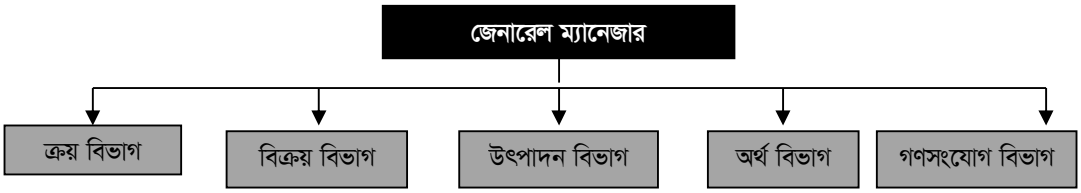

চিত্র: কার্যভিত্তিক বিভাগীকরণ।

- **ব্যবস্থাপকের কার্যভিত্তিক বিভাগীকরণ (Departmentalization by Managerial Functions)ঃ** ব্যবস্থাপকেরা যেসব কার্যাবলি সম্পাদন করেন সেগুলোর উপর ভিত্তি করেও বিভাগীকরণ করা যায়। এরূপ বিভাগীকরেণে পরিকল্পনা, সংগঠন, স্টাফিং, নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থাপকীয় কার্যের জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। তবে এরূপ বিভাগীকরণ পদ্ধতি খুব কমই ব্যবহার করা হয়। কারণ, এতে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাজের সাথে সঠিকভাবে সঙ্গতি রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিভাগীকরণের ধরণ অনুযায়ী কর্মী নির্বাচন করা উচিৎ। কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকদের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন কর্মী কোন বিভাগের জন্য উপযুক্ত। পূর্বের পাঠগুলোর আলাচনায় দেখা যায়, কর্মীর সন্তুষ্টি অনেকাংশে নির্ভর করে তার কর্ম এবং কর্মস্থলের উপর। যে বিভাগে কর্মীর কাজ করার ইচ্ছা বা আকাংখা নাই সেখানে তাকে নিযুক্ত না করাই শ্রেয়। এতে কর্মীর কাজ করার স্পৃহা কমে যায় এবং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এখানে শুধু উৎপাদনে জড়িত কর্মীর কথা চিন্তা করলেই হবে না, ব্যবস্থাপকদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

বিভাগীকরণের সময় কী কী বিষয় বিবেচনা করা উচিত

What Factors Should be Considered While Departmentalizing

বিভাগীকরণ সম্পর্কে আমরা জানলাম। প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, যেকোনো অবস্থাতে কিংবা পরিবেশে বিভাগীকরণ করা উচিৎ? ব্যবস্থাপক কি চাইলেই প্রতিষ্ঠানে বিভাগীকরণ করতে পারে? বিভাগীকরণের সময় একজন ব্যবস্থাপকের কী কী বিষয়ের উপর নজর দেয়া প্রয়োজন? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে হলে, বিভাগীকরণের বিবেচ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। আসুন, বিষয়গুলো জেনে নিই।

১. বিশেষায়ণ (Specialization)ঃ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বহু প্রকারের বিশেষায়িত কাজ করার প্রয়োজন হয়। তাই বিভাগীকরণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন বিশেষায়ণের দিকটি কোনভাবেই উপেক্ষিত না হয়। সেই সাথে খেয়াল

রাখতে হবে- কোন কর্মী কোন কাজে দক্ষ এবং কোন কাজে তার আগ্রহ রয়েছে। এ বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে কর্মীর আচরণ ও কর্ম সন্তুষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করে।

২. প্রতিষ্ঠানের ভিতরকার স্থানীয় অবস্থান অনুধাবন (Recognition to local conditions)ঃ একেক প্রতিষ্ঠানের ভেতরের অবস্থা একেক রকম হয়ে থাকে। তাই কার্যাবলি বিভাগীকরণের সময় প্রতিষ্ঠানের ভেতরকার স্থানীয় অবস্থা-পরিবেশ বিবেচনায় রেখে বিভাগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তাহলে বিভাগগুলোর কার্যাবলি সাবলীলভাবে সম্পাদন করা কর্মীদের পক্ষে সম্ভব হয়।

৩. সহজ নিয়ন্ত্রণের সুবিধা (Advantages of easy control)ঃ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি বিভাগীকরণের সময় বিভাগীয় কার্যাবলী এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। নিয়ন্ত্রণ-কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার উপর প্রতিষ্ঠানের সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

৪. বিভাগীয় সমন্বয়সাধন নিশ্চিতকরণ (Ensuring departmental coordination)ঃ বিভাগীকরণের সময় সমন্বয়সাধনের উপরও গুরুত্ব দেয়া বাঞ্ছনীয়। বিভাগগুলো এমনভাবে সৃষ্টি করতে হবে যাতে প্রতিটি বিভাগের কাজের সাথে অন্যান্য বিভাগের কাজের সমন্বয়সাধন সম্ভব হয়। নতুবা প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যাবে।

৫. মিতব্যয়িতা (Economy)ঃ বিভাগীকরণের সাথে ব্যয়ের সম্পর্ক জড়িত। তাই বিভাগ খোলার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিষয় বিবেচনায় রাখা দরকার। বিভাগীকরণকালে একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লাভের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, তেমনি অন্যদিকে ব্যয় হ্রাস করতে গিয়ে যাতে সার্বিক দক্ষতার উপর প্রতিকূল প্রভাব না পড়ে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

৬. পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত (Caring for situations)ঃ অনেক সময় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যা মোকাবেলা করার জন্য বিশেষ বিভাগ খোলার প্রয়োজন হতে পারে। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই পরিস্থিতি ভিত্তিক বিভাগীকরণের প্রয়োজন হয়।

৭. দক্ষতা নিশ্চিতকরণ (Ensuring efficiency)ঃ বিভাগীকরণের সময় দেখতে হবে যেন কোনভাবেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক দক্ষতা বিঘ্নিত না হয়। বড় বড় প্রতিষ্ঠানে অজস্র প্রকারের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। এগুলো বিশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করা হলে দক্ষতা অর্জন সম্ভব নয়। তাই সুষ্ঠভাবে বিভাগ সৃষ্টি করে দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

৮. বিশেষ কাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান (Special emphasis on special activities)ঃ সব প্রতিষ্ঠানেই এমন কিছু কাজকর্ম থাকে যেগুলো তুলনামূলকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিভাগীকরণের সময় এ ধরনের কাজের জন্য আলাদা বিভাগ খোলার প্রয়োজন হতে পারে।

৯. আর্থিক সামর্থ্য (Financial ability)ঃ ইচ্ছা করলেই একটি প্রতিষ্ঠান অনেকগুলো বিভাগ খুলতে পারে না। প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব দেয়ার জন্য যে জনবলের প্রয়োজন তা নিয়োগ করতে হলে বেতন-ভাতা বাবদ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাছাড়া, নতুন বিভাগ সজ্জিতকরণের জন্যও অর্থের দরকার । কাজেই বিভাগীকরণের সময় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

সংগঠন কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য বিভাগীকরণ প্রয়োজন। বিভাগীয়করণ হলো একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সমজাতীয় কার্যাবলিকে আলাদা আলাদা বিভাগের আওতাধীনে আনয়ন করা হয়। এক একটি বিভাগের অধীনে একই শ্রেণির কাজগুলোকে বিন্যস্ত করাই হলো বিভাগীকরণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বিভাগীয়করণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো একই শ্রেণির কাজকে একটি বিভাগের অধীনে রেখে কার্যক্রমে শৃংখলা আনয়ন করা এবং বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে দয়বদ্ধ করা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভাগীকরণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ উদ্দেশ্যভিত্তিক, প্রক্রিয়াভিত্তিক এবং কার্যভিত্তিক বিভাগীকরণ।

পাঠ ১০.৩ আদেশের শৃংখল
Chain of Command

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আদেশের শৃংখল সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।

চল্লিশ বছর আগে আদেশের শৃংখল (Chain of Command) ধারণাটি প্রতিষ্ঠানের নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক ভিত্তি ছিল। দলভিত্তিক কর্মসম্পাদনের ফলপ্রসূতার কারণে বর্তমানে এর গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছে। কিন্তু সাংগঠনিক কাঠামো গঠনকালে সমকালীন ব্যবস্থাপকদের এখনও এর প্রভাবগুলো বিবেচনায় রাখা উচিত।

আদেশের শৃংখল হচ্ছে একটি অবিচ্ছিন্ন সরলরৈখিক কর্তৃত্ব যা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। এ পদ্ধতি "কে" "কার" নিকট রিপোর্ট করবে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে কর্মী জানতে পারেঃ "আমি যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হই তাহলে কার কাছে যাবো?" এবং "আমি কার কাছে দায়বদ্ধ?"

আদেশের শৃংখল ধারণাটি বুঝতে হলে দু'টি পরিপূরক ধারণা সম্পর্কে জেনে রাখা আবশ্যকঃ

(ক) কর্তৃত্ব
(খ) আদেশের ঐক্য

আসুন, এ দু'টি ধারনা সম্পর্কে জেনে নিই।

কর্তৃত্ব (Authority)ঃ

কর্তৃত্ব বলতে কোন কাজ করার আইনানুগ ক্ষমতাকে বুঝায়। কর্তৃত্বের বলেই একজন ব্যবস্থাপক তার অধীনস্থ কর্মীদেরকে আদেশে-নির্দেশ দিয়ে থাকেন। ব্যবস্থাপকেরা প্রতিষ্ঠানের কাজ থেকে আইনসিদ্ধ উপায়ে কর্তৃত্ব পেয়ে থাকেন। কর্তৃত্ব সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা ইউনিট-৮ এ আলোচনা করা হয়েছে।

আদেশের ঐক্য (Unity of Command)ঃ

প্রত্যেক কর্মী একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য মাত্র একজন ব্যক্তির কাছ থেকে নির্দেশ পাবে। অর্থাৎ, একজন কর্মীর দু'জন বস্ (boss) থাকবেনা। আদেশের ঐক্য হচ্ছে ব্যবস্থাপনার নীতির মধ্যে একটি। সরলরৈখিক কর্তৃত্বকে অবিচ্ছিন্ন রাখতে এই নীতি সাহায্য করে। যদি আদেশের ঐক্য নষ্ট হয় তাহলে কর্মীরা বিভ্রান্তিতে থাকে। একের অধিক উর্ধ্বতনের কাছ থেকে কাজের নির্দেশ আসতে পারে যা সম্পন্ন করা কর্মীর পক্ষে প্রায়শই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এতে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ ও তারা দ্বিধাগ্রস্থ হয়।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সংগঠনের চিত্রও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রযুক্তির প্রসারের কারণে বর্তমান সময়ে আদেশের শৃংখল, কর্তৃত্ব এবং আদেশের ঐক্য ধারনার প্রাসঙ্গিকতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের প্রবণতা এখন কর্মীদের ক্ষমতায়নের দিকে। এখন একজন নিম্ন পর্যায়ের কর্মীও মিনিটের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে যা অতীতে উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। একইভাবে, প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মীরা আনুষ্ঠানিক চ্যানেল ব্যবহার না করেই প্রতিষ্ঠানে যেকোন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। অপারেটিং-এর সাথে জড়িত কর্মীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে যা পূর্বে ব্যবস্থাপকদের হাতে বন্দি ছিল। এ কারণে আদেশের ঐক্য ধারনার প্রচলন দিন দিন কমে যাচ্ছে। তদুপরি, এখনও বহু প্রতিষ্ঠান মনে করে আদেশের শৃংখল ফলদায়ক।

সারসংক্ষেপ

আদেশের শৃংখল হচ্ছে একটি অবিচ্ছিন্ন সরলরৈখিক কর্তৃত্ব যা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। এ পদ্ধতি "কে" "কার" নিকট রিপোর্ট করবে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে থাকে। এ ধারণাটি দু'টি পরিপূরক ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। একটি হচ্ছে কর্তৃত্ব এবং অপরটি হচ্ছে আদেশের ঐক্য। কর্তৃত্ব বলতে কোন কাজ করার আইনানুগ ক্ষমতাকে বুঝায়। আদেশের ঐক্য হচ্ছে, প্রত্যেক কর্মী একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য মাত্র একজন ব্যক্তির কাছ থেকে নির্দেশ পাবে। প্রযুক্তির প্রসারের কারণে বর্তমান সময়ে আদেশের শৃংখল, কর্তৃত্ব এবং আদেশের ঐক্য ধারনার প্রাসঙ্গিকতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের প্রবণতা এখন কর্মীদের ক্ষমতায়নের দিকে। তদুপরি, এখনও বহু প্রতিষ্ঠান মনে করে আদেশের শৃংখল ফলদায়ক।

পাঠ ১০.৪ তত্ত্বাবধান পরিসর
Span of Supervision

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- তত্ত্বাবধান পরিসরের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- তত্ত্বাবধান পরিসর কিভাবে নির্ণয় করতে হয় জানতে পারবেন।
- তত্ত্বাবধান পরিসরের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন।
- তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সংগঠিতকরণ-কার্যের একটি অন্যতম উপাদান হলো প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদের মধ্যে জবাবদিহিতার সম্পর্ক বা রিপোর্টিং-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। ধরুন, মাঝারি ধরনের প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক চারজন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেছেনঃ একজন কর্মী বিভাগের জন্য, একজন অর্থ বিভাগের জন্য, একজন উৎপাদন বিভাগের জন্য এবং একজন বিপণন বিভাগের জন্য। বিপণন ব্যবস্থাপক তার কাজের জন্য কি উৎপাদন ব্যবস্থাপকের নিকট জবাবদিহি করবেন, না-কি অর্থ ব্যবস্থাপকের নিকট, না-কি মহাব্যবস্থাপকের নিকট? অন্যান্য ব্যবস্থাপকদের জন্যও একই প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে রিপোটিং-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট মূল বিষয়গুলো; অর্থাৎ 'চেইন অব কমান্ড' এবং তত্ত্ববধান পরিসর সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণ। তত্ত্বাবধান পরিসর যা **ব্যবস্থাপনা পরিসর** (span of management) বা **নিয়ন্ত্রণ পরিসর** (span of control) নামেও পরিচিত। এ পাঠে আমরা তত্ত্বাবধান পরিসর সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করবো।

তত্ত্বাবধান পরিসরের অর্থ
Meaning of Span of Supervision

একজন নির্বাহী (executive) বা সুপারভাইজার অনেক কর্মীর কাজকর্ম তদারক করে থাকেন। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো- একজন নির্বাহী সর্বোচ্চ কত জনের কাজ সুষ্ঠুভাবে তদারক করতে পারেন? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। তবে এ প্রশ্নের সাথেই সম্পর্কিত তত্ত্বাবধান পরিসর-এর বিষয়টি।

তত্ত্বাবধান পরিসর বলতে একজন নির্বাহী কর্তৃক তত্ত্বাবধানকৃত অধীনস্থ কর্মীদের সংখ্যাকে বুঝায়। নির্বাহী দক্ষতার সাথে যে কয়জন অধস্তন কর্মীকে তদারক করতে পারেন সেটিই হলো তার তত্ত্বাবধান পরিসর। এ পরিসর সর্বদাই এমন হওয়া উচিত-যা ছোটও নয়, বড়ও নয়। অর্থাৎ তত্ত্বাবধান পরিসর কাম্য (optimum) হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ তত্ত্বাবধান পরিসর বড় হলে নির্বাহীর পক্ষে সবাইকে ঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয় না। এতে প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। আবার, পরিসর বেশি ছোট হলে অধিক সংখ্যক নির্বাহীর প্রয়োজন হবে এবং খরচও বেড়ে যাবে। তত্ত্বাবধান পরিসর ছোট হলে প্রতিষ্ঠানে 'স্তরের' (Levels) সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। পরিসর বড় হলে স্তরের সংখ্যা কম হবে। চিত্রে একটি তত্ত্বাবধান পরিসরের উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

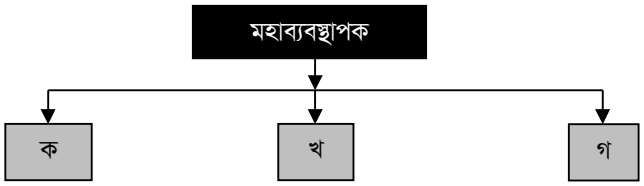

চিত্র: মহাব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধান পরিসর

এ উদাহরণে, মহাব্যবস্থাপকের অধীনে তিন জন ব্যবস্থাপক রয়েছেন- ক, খ ও গ। সুতরাং তার তত্ত্বাবধান পরিসর হলো তিন।

তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ণয়করণ

Estimating Span of Supervision

এ.ভি. গ্রেইকুনাস (A.V. Graicunas) ১৯৩৩ সালে একটি নিবন্ধে তত্ত্বাবধান পরিসর হিসাব করার জন্য একটি সূত্র (formula) দিয়েছিলেন। তার এ নিবন্ধটি ১৯৩৩ সালের ৭ই মার্চ International Institute of Management-বুলেটিনে প্রকাশিত হয়েছিল। তার সূত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

$$I = (N \frac{2N}{2} + N - 1)$$

এখানে, I = অধস্তন কর্মীদের সঙ্গে নির্বাহীর এবং কর্মীদের নিজেদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়ার মোট সংখ্যা (total number of interactions with and among subordinates)। N = অধস্তন কর্মীদের সংখ্যা (number of subordinates)।

এ ফর্মুলা অনুযায়ী হিসাব করলে দেখা যাবেঃ যদি একজন নির্বাহীর শুধু দু'জন অধস্তন কর্মী থাকে, তাহলে মোট মিথস্ক্রিয়ার (interactions) সংখ্যা হবে ৬; অধস্তনদের সংখ্যা তিন হলে মিথস্ক্রিয়ার সংখ্যা হবে ১৮; এবং অধস্তনের সংখ্যা ৫ হলে মিথস্ক্রিয়ার সংখ্যা হবে ১০০। এতে দেখা যাচ্ছে যে, অধস্তনের সংখ্যা একজন করে বাড়লেও আন্তঃসম্পর্কের জটিলতা যথেষ্ট বেড়ে যায়। গ্রেইকুনাস অবশ্য কাম্য পরিসর বা N -এর আদর্শ মান কত হবে সে সম্পর্কে কিছু বলেননি। তার সূত্র থেকে আমরা আন্তঃসম্পর্কের জটিলতা সম্পর্কে জানতে পারি। কাম্য সংখ্যা কত হবে সে-সম্বন্ধে নির্বাহীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তত্ত্বাবধান পরিসরের প্রকারভেদ

Types of Span of Supervision

তত্ত্বাবধান পরিসরকে তত্ত্বাবধিত (supervised) অধস্তনের সংখ্যার ভিত্তিতে কিংবা ব্যবস্থাপনার স্তরের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। নিচের চিত্রটি দেখুনঃ

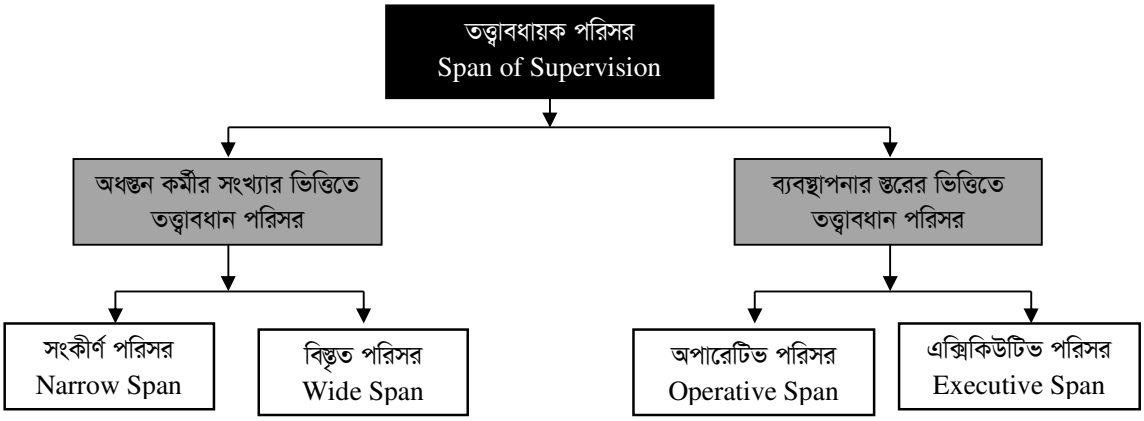

চিত্র: তত্ত্বাবধান পরিসরের শ্রেণিবিন্যাস

(১) **সংকীর্ণ তত্ত্বাবধান পরিসর (Narrow Span of Supervision)**ঃ সাধারণত, একজন নির্বাহীর অধীনস্থ কর্মীরা স্বল্প হলে তত্ত্বাবধান পরিসর সংকীর্ণ হয়। তবে তত্ত্বাবধান করতে হবে এমন কর্মীর সংখ্যা কত হলে তাকে সংকীর্ণ পরিসর বলা যাবে, এমন কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা কেউ দেয়নি। এটি স্থান-কাল-পাত্রের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। কোনো

নির্বাহীর ক্ষেত্রে হয়-তো ১০ জন অধস্তন কর্মীকে 'সংকীর্ণ পরিসর' হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে; কিন্তু অন্য এক-জনের ক্ষেত্রে হয়তো ৫ জনের বেশি হলে তাকে সংকীর্ণ পরিসর বলা যাবে না।

(২) **বিস্তৃত তত্ত্বাবধান পরিসর (Wide Span of Supervision)ঃ** সাধারণভাবে বলা যায় যে, একজন নির্বাহীর অধীনস্থ কর্মীর সংখ্যা বেশি হলে তার তত্ত্বাবধান পরিসর 'বিস্তৃত পরিসর' হিসেবে আখ্যায়িত হবে। তবে 'বেশি' বলতে কত সংখ্যাকে বুঝাবে তৎসম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রচলিত নেই। এটিও পরিস্থিতি-পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।

(৩) **অপারেটিভ ও এক্সিকিউটিভ পরিসর (Operative and Executive Spans)ঃ** রাল্‌ফ সি. ডেভিস (Ralph C. Davis) নামে একজন গ্রন্থকার দু'প্রকার পরিসরের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ একটি হলো অপারেটিভ পরিসর এবং অন্যটি এক্সিকিউটিভ পরিসর। প্রথমটি নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকদের জন্য প্রযোজ্য এবং দ্বিতীয়টি মধ্যম ও উচ্চ-পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, অপারেটিভ পরিসর ৩০ জন পর্যন্ত হতে পারে এবং এক্সিকিউটিভ পরিসর ৩ থেকে ৯-এর মধ্যে সীমিত রাখা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের কাজের ধরন, প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধির হার এবং অনুরূপ বিষয়াদি বিবেচনা করতে হবে। অবশ্য লিন্ডাল ইউরিক (Lyndall Urwick) এবং জেনারেল আয়ান হ্যামিল্টন (General Ian Hamilton) এক্সিকিউটিভ পরিসরের সংখ্যা ৬ জনে সীমিত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

আমেরিকার সিয়ার্স রুবাক কোম্পানি (Sears Roebuck & Co.)- তে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, বিস্তৃত পরিসর বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মনোবল ও উৎপাদনশীলতা বেশি। গবেষকরা আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সংকীর্ণ পরিসরের কারণে যে 'লম্ব সাংগঠনিক কাঠামো' (tall structure)- এর উদ্ভব হয়, তা ব্যয়সাধ্য (বেশি সংখ্যক ব্যবস্থাপক থাকার কারণে) এবং এতে যোগাযোগ-সমস্যারও সৃষ্টি হয় (বেশি সংখ্যক লোকের মাধ্যমে তথ্য প্রবাহিত হওয়ার কারণে)। অনেক বিশেষজ্ঞ মত পোষণ করেন যে, স্বল্প স্তর বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান (বিস্তৃত তত্ত্বাবধান পরিসর) অধিক দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে। এ যুক্তির ভিত্তিতে ফ্রাংকলিন মিন্ট কোম্পনি সম্প্রতি ব্যবস্থাপনার স্তর ৬ থেকে ৪-এ হ্রাস করেছেন এবং এ কোম্পানির প্রধান নির্বাহী স্টিওয়ার্ট রেসনিক তার তত্ত্বাবধান পরিসর ৬ থেকে ১২-তে উন্নীত করেছেন। অনুরূপভাবে আইবিএম কোম্পানিও অনেকগুলো ব্যবস্থাপনার স্তর তুলে দিয়েছে। এ প্রবণতার মূল কারণ হলো, স্বল্প সংখ্যক ব্যবস্থাপনা স্তরের কারণে যোগাযোগ প্রবাহ সাবলীল হয় এবং ব্যবস্থাপকেরা অধিক সংখ্যক কর্মীর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে তুলে সহজে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

Factors Determining Optimum Span of Supervision

কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থাপকদের কাম্য-তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণ করার জন্য আপনাকে দায়িত্ব দেয়া হলে আপনি কিভাবে তা করবেন? আপনি একটি গ্রহণযোগ্য তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণ করার জন্য নিম্নোক্ত উপাদানগুলো বিবেচনা করতে পারেন ঃ

১. **নির্বাহীদের দক্ষতাঃ** নির্বাহীরা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও নেতৃত্বদানে দক্ষ হলে বেশি সংখ্যক কর্মী একসাথে তত্ত্বাবধান করতে সক্ষম হবেন। এমতাবস্থায় তত্ত্বাবধান পরিসর বড় হলেও অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে।

২. **অধস্তন কর্মীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাঃ** অধস্তন কর্মীরা অভিজ্ঞ হলে, তাদের নিজ নিজ কর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান পর্যাপ্ত থাকলে, দক্ষতার কমতি না থাকলে তাদের কাজ বেশি সময় নিয়ে তদারকি করার প্রয়োজন হবে না। এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান পরিসর বড় হতে পারে। আর, অধস্তনদের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ কম থাকলে তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য নির্বাহীকে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হবে। ফলে তত্ত্বাবধান পরিসর এক্ষেত্রে ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩. **প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের ধরণঃ** প্রতিষ্ঠানে যেসব কার্যাবলি সম্পাদিত হয় সেগুলো যদি সরল প্রকৃতির হয়- জটিল না হয়, তাহলে তত্ত্বাবধান পরিসর বড় রাখা যায়। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে বেশি সংখ্যক কর্মীকে একসথি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব; তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনও সহজ হয়। পক্ষান্তরে, জটিল কর্মকাণ্ড অধিকসংখ্যক কর্মীর নিয়ন্ত্রণকে দুঃসাধ্য করে তোলে। ফলে তত্ত্বাবধান পরিসর ছোট রাখাই সুবিবেচিত বলে মনে হয়।

৪. **একার্থক ও স্থায়ী পরিকল্পনার ব্যবহারঃ** প্রতিষ্ঠানে একার্থক পরিকল্পনা ব্যবহারের প্রবণতা বেশি থাকলে কর্মীদেরকে বার বার নির্দেশ-পরামর্শ দিতে হয়। আবার, স্থায়ী পরিকল্পনার ব্যবহার বেশি হলে কর্মীরা একই প্রকার কাজ বার বার সম্পাদন করে বলে তাদের কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধি পায় তাদেরকে ঘন ঘন নির্দেশ-উপদেশ দিতে হয় না। তাই একার্থক পরিকল্পনার অধিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান পরিসর ছোট হয় এবং স্থায়ী পরিকল্পনা বেশি ব্যবহারের প্রবণতা থাকলে তত্ত্বাবধান পরিসর বড় হয়।

৫. **প্রাতিষ্ঠানিক কাজ নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতিঃ** প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিভিন্ন কর্মীর কাজসমূহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পর্যান্ত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে একজন নির্বাহী একসঙ্গে অনেক কর্মীর কাজ তদারক করতে পারেন। ফলে তত্ত্বাবধান পরিসর বড় হলে অসুবিধা হয় না। তাই দেখা যায়, নিয়ন্ত্রণ কৌশলের পর্যাপ্ততার উপর ভিত্তি করে তত্ত্বাবধান পরিসর বড়-ছোট হয়।

৬. **নির্বাহীর কর্ম ব্যস্ততাঃ** খুবই ব্যস্ত নির্বাহীরা কর্মীদের কাজকর্ম তদারকিতে বেশি সময় দিতে পারেন না। তাই তাদের জন্য তত্ত্বাবধান পরিসর ছোট হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সারসংক্ষেপ

নির্বাহী দক্ষতার সাথে যে কয়জন অধস্তন কর্মীকে তদারক করতে পারেন সেটিই হলো তার তত্ত্বাবধান পরিসর। এ পরিসর সর্বদাই এমন হওয়া উচিত- যা ছোটও নয়, বড়ও নয়। অর্থাৎ তত্ত্বাবধান পরিসর কাম্য (optimum) হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ.ভি. গ্রেইকুনাস (A.V. Graicunas) ১৯৩৩ সালে একটি নিবন্ধে তত্ত্বাবধান পরিসর হিসাব করার জন্য একটি সূত্র দিয়েছিলেন। এ সূত্র অনুযায়ী হিসাব করলে দেখা যায়, অধস্তনের সংখ্যা একজন করে বাড়লেও আন্তঃসম্পর্কের জটিলতা যথেষ্ট বেড়ে যায়। তত্ত্বাবধান পরিসরকে তত্ত্বাবধিত (supervised) অধস্তনের সংখ্যার ভিত্তিতে কিংবা ব্যবস্থাপনার স্তরের ভিত্তিতে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ সংকীর্ণ তত্ত্বাবধান পরিসর, বিস্তৃত তত্ত্বাবধান পরিসর, অপারেটিভ এবং এক্সিকিউটিভ পরিসর। উল্লেখ্য, কাম্য-তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণ করার জন্য কতিপয় উপাদান বিবেচনায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

পাঠ ১০.৫ আনুষ্ঠানিকীকরণ
Formalization

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আনুষ্ঠানিকীকরণ কী জানতে পারবেন।

আনুষ্ঠানিকীকরণ হচ্ছে সংগঠনের কাজগুলোকে প্রমিতকরণ (Standardization) করা। সংগঠনে যে সব সমস্যা বা বিষয় পুনঃপুনঃ ঘটে সেগুলোর সমাধানকল্পে যেসব নিয়ম-নীতি, প্রথা বা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয় তাকে প্রমিতকরণ বলে। কোন সংগঠনে নিয়ম-নীতি, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি কতটা লিপিবদ্ধ করা হয় তার উপরই নির্ভর করে আনুষ্ঠানিকতা। যেসব সংগঠনে একই ধরনের কার্যাবলি বার বার পর্যায়ক্রমিকভাবে ঘটার সম্ভাবনা বেশি সেসব ক্ষেত্রে সংগঠন আনুষ্ঠানিকতার দিকেই বেশি মনযোগী হয়।

যদি কোনো কাজ অধিকমাত্রায় আনুষ্ঠানিক হয় তাহলে কী করতে হবে, কখন করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে তা পূর্বেই নির্ধারিত থাকে। এখানে কর্মীর ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। কর্মীদের কাছ থেকে সবসময় একই ফলাফল একইভাবে আশা করা হয়। সংগঠনের যেখানে অধিক মাত্রায় আনুষ্ঠানিকীকরণ রয়েছে সেক্ষেত্রে কাজের সুস্পষ্ট বর্ণনা, বহুবিধ সাংগঠনিক নিয়মাবলী এবং কর্ম ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকীকরণ কম সেখানে কর্মীদের কাজের স্বাধীনতা বেশি থাকে। স্বাভাবিকভাবেই কাজের নিয়ম-নীতি কম থাকে।

প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আনুষ্ঠানিকীকরণ মাত্রায় ব্যাপক ভিন্নতা থাকতে পারে। যেমন ধরুন, নির্দিষ্ট কিছু কাজ রয়েছে যেগুলোর আনুষ্ঠানিকীকরনের মাত্রা অনেক কম। ভ্রমন কাহিনী নির্ভর বইয়ের প্রকাশক যখন কলেজের একজন শিক্ষককে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তাদের নতুন প্রকাশিত বইগুলো সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে তখন যোগাযোগের এ প্রক্রিয়ায় প্রকাশকের ব্যাপক স্বাধীনতা থাকে। বিক্রয় প্রসারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোন মান না-ও থাকতে পারে। আবার, এ একই প্রতিষ্ঠানে কেরানি ও সম্পাদকীয় পদে যারা কর্মরত আছেন তাদের প্রতিদিন সকাল ৮ টার মধ্যে অফিসে আসতে হয়, দুপুর ১টায় মধ্যাহ্ন-বিরতি ও দুপুর ২ টার মধ্যে আবার কাজ শুরু করতে হয় এবং ব্যবস্থাপকদের নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় তাদের কর্মসম্পাদন করতে হয়। এ উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে, একই প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় প্রচারের কাজটি কম আনুষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে আবার দাপ্তরিক কাজগুলোকে অতিমাত্রায় আনুষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে।

এ ইউনিট পর্যালোচনাপূর্বক আমরা বলতে পারি, প্রতিষ্ঠানের জন্য সঠিক সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নকালে ব্যবস্থপককে কমপক্ষে ছয়টি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এ প্রশ্নগুলোর যথাযথ জবাব নির্ধারণ করার উপরই নির্ভর করে একজন ব্যবস্থাপক তার প্রতিষ্ঠানের জন্য সঠিক সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করতে পারবেন কি, পারবেন না। এসব প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে তার জবাব কী হতে পারে, তা নিচের ছকে দেখানো হয়েছেঃ

প্রশ্নসমূহ	প্রত্যাশিত জবাব
১. কি মাত্রায় কার্যসমূহকে আলাদা আলাদা পদে বিভক্ত করা হয়?	কার্যের বিশেষায়ন
২. কিসের ভিত্তিতে পদগুলোকে একত্রিত করা হবে?	বিভাগীকরণ
৩. কার কার নিকট ব্যক্তি ও গ্রুপসমূহ রিপোর্ট করবে?	আদেশের শৃংখল
৪. কতজন ব্যক্তিকে একজন ব্যবস্থাপক নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারবে?	নিয়ন্ত্রণ/তত্ত্বাধান পরিসর

৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব কোথায় নিহিত?	কেন্দ্রিকরণ ও বিকেন্দ্রিকরণ
৬. কর্মী ও ব্যবস্থাপকদেরকে পরিচালনার জন্য কী পরিমানে নিয়ম-কানুন থাকবে?	আনুষ্ঠানিকীকরণ

সারসংক্ষেপ

আনুষ্ঠানিকীকরণ হচ্ছে সংগঠনের কাজগুলোকে প্রমিতকরণ (Standardization) করা। সংগঠনে যে সব সমস্যা বা বিষয় পুনঃপুনঃ ঘটে সেগুলোর সমাধানকল্পে যেসব নিয়ম-নীতি, প্রথা বা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। তাকে প্রমিতকরণ বলে। যদি কোন কাজ অধিকমাত্রায় আনুষ্ঠানিক হয় তাহলে কী করতে হবে, কখন করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে তা পূর্বেই নির্ধারিত থাকে। এখানে কর্মীর ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। কর্মীদের কাছ থেকে সবসময় একই ফলাফল একইভাবে আশা করা হয়। প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আনুষ্ঠানিকীকরণ মাত্রায় ব্যাপক ভিন্নতা থাকতে পারে।

পাঠ ১০.৬ সমন্বয়সাধন
Coordination

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমন্বয়সাধন কী জানতে পারবেন।
- সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমন্বয়সাধনের কৌশলগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকারের সমন্বয়সাধন সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

সমন্বয়সাধনকে সংগতিকরণ-কার্যের অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোনো কোনো গ্রন্থকার সমন্বয়সাধন (coordination)- কে ব্যবস্থাপার একটি আলাদা কার্য হিসেবে বিবেচনা করেন। যে যেভাবেই বিবেচনা করুন না কেন, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই সমন্বয়সাধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিশেষতঃ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজগুলোকে কয়েকটি বিভাগের অধীনে নিয়ে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই আলাদা আলাদা বিভাগের সৃষ্টি হয়। এসব বিভাগ গঠিত হওয়ার পর থেকেই এগুলোর একের কার্যাবলির সাথে অপরের কার্যাবলির একট যোগসূত্র (link) স্থাপন করা খুবই জরুরী। কারণ সবগুলো বিভাগের কাজ-কর্ম সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যই পরিচালিত হয়। তাই প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন সহজতর করার জন্য এক বিভাগের কার্যাবলির সাথে অন্যান্য বিভাগের কার্যাবলির সমন্বয়সাধন একান্ত দরকার।

সমন্বয়সাধনের সংজ্ঞা
Definition of Coordination

সমন্বয়সাধন ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উপকরণের একত্রিকরণের পর উৎপাদন বা সেবা প্রদান শুরু হলে এরপর বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয়সাধনের দরকার পড়ে। কারণ, ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বিচ্ছিন্নভাবে সম্পাদিত হতে পারে না। সকল কার্যাবলি সুসমন্বিতভাবে সম্পাদিত হলেই কেবল উদ্দেশ্য অর্জন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে থাকে।

ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তেমনি ব্যবস্থাপনার একজন ব্যক্তির কাজও আরেকজন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত। একক ও অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য যখন সকলের কার্যাবলি সম্পাদিত হতে থাকে তখন তাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কের কারণে প্রত্যেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদন করে পরবর্তী জনের কাছে প্রেরণ করে। এরূপ একটি সম্পর্ককে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে সমন্বয়সাধন বলা হয়। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে একজনের কাজ যেহেতু আরেকজনের কার্যের উপর নির্ভরশীল, কাজেই প্রত্যেকের মধ্যে একটি কার্যগত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক। এ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থাকেই সমন্বয় বলা হয়ে থাকে। আসুন, একটি উদাহরণের সাহায্যে সমন্বয়সাধনের ধারণাটি পরিষ্কার করা যাক। ধরুন, আপনি একটি বড় কাপড়ের মিলের মার্কেটিং ম্যানেজার। আপনি বিদেশ থেকে ৫ লাখ মিটার সাদা কাপড়ের অর্ডার সংগ্রহ করেছেন। আপনার মিলের উৎপাদন ব্যবস্থাপক কাপড় উৎপাদন করবেন। মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপক কাপড়ের মান নিশ্চিত করবেন। এখন আপনাদের তিন জনের তিন রকম কাজের মধ্যে যদি সমন্বয় থাকে তাহলেই কেবল কাপড়গুলো যথাসময়ে ক্রেতাকে সরবরাহ করা সম্ভব। আর যদি কেউ আপনার সাথে কাপড়গুলো সরবরাহ করতে সহযোগিতা না করে অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থাপক যথাসময়ে উৎপাদন কার্য সমাপ্ত করলেন না, মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপক যথারীতি কাপড় সাদা রং নিশ্চিত করতে পারলেন না, তাহলে কি আপনার পক্ষে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে ও মূল্যে কাপড় সরবরাহ করা সম্ভব হবে? কিছুতেই সম্ভব হবে না। অর্ডার সরবরাহ করতে হলে আপনাদের সকলের কাজের মধ্যে সুসমন্বয় আবশ্যক। উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আসুন সমন্বয়সাধনের তিনটি সংজ্ঞা নিরূপণ করা যাক।

জর্জ.আর. টেরি (George R. Terry) বলেন, নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনে সুসামঞ্জস্য এবং সমতা ভিত্তিক প্রচেষ্টা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যাবলির ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই সমন্বয়সাধন।

কুঞ্জ এবং তাঁর সহযোগীবৃন্দের (Koontz and Associates) মতে, দলীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত ও দলীয় প্রচেষ্টার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকে সমন্বয়সাধন বলে (Coordination may be defined as the achieving harmony of individual and group efforts toward the accomplishment of group purposes and objectives)।

স্টোনার- এর মতে, "Coordination is the process of integrating the activities of separate departments in order to pursue organizational goods efficiently."

উপরের সংজ্ঞাগুলো থেকে আমরা বলতে পারি, সমন্বয়সাধন হলো আসলে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের কাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের প্রক্রিয়া।

সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা

Necessity of Coordination

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের কার্যের মধ্যে সমন্বয় বা সামঞ্জস্যর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সমন্বয়সাধনের প্রক্রিয়া ব্যক্তিক বা দলীয় প্রচেষ্টাকে একীভূত এবং একসূত্রে গ্রথিত করে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে। সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি এবং তাদের কার্যাবলির মধ্যে সমতা বা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়- যে সমতা বা ভারসাম্য ছাড়া ব্যবস্থাপনার পক্ষে উদ্দেশ্য অর্জন কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। বিচ্ছিন্নতা নয়, সমন্বয় ব্যবস্থাপনার সকল ব্যক্তিকে একই উদ্দেশ্যমুখী বানাতে পারে এবং উদ্দেশ্য অর্জনে পরিচালিত করে। আপনি যখন ফুটবলের মাঠে খেলা উপভোগ করতে যান তখন লক্ষ্য, করেন যে, এগার জন খেলোয়াড়ই কিন্তু একা গোল করার চেষ্টা করে না, সম্ভবও নয়। সকলের পূর্ণ সহযোগিতায় প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। সুসমন্বয়সাধনের মাধ্যমেই দলীয় প্রচেষ্টা সাফল্যের গৌরব অর্জন করে। সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা এটি একটি বড় উদাহরণ।

সমন্বয়সাধন বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১. **শৃঙ্খলা সৃষ্টিঃ** সমন্বয়সাধনের ফলে কারবার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় । কারণ সকলেই অভিন্ন লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদন করে।
২. **বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ঐক্যমতঃ** ব্যবস্থাপনার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরস্পরের সাথে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়। সমন্বয়সাধন প্রক্রিয়া এ বন্টন অটুট রাখে।
৩. **ভারসাম্য আনয়নঃ** কারবার প্রতিষ্ঠানে যে সব ব্যক্তি যোগদান করেন তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার পার্থক্যহেতু কার্যের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হতে পারে। সমন্বয়সাধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ ভারসাম্যহীনতা দূর করে সমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়।
৪. **দ্রুত লক্ষ্য অর্জনঃ** সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে যখন ব্যবস্থাপনার সকল কার্য সম্পাদিত হতে থাকে তখন মতবিরোধ, বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা ইত্যাদি হ্রাস পায়। ফলে দ্রুত লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।
৫. **উন্নত সেবাঃ** সমন্বয়সাধন দ্রুততর উৎপাদন ও সেবা সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করে। ব্যস্থাপনার সবাই যখন পরস্পরের সহায়তার প্রয়োজনের প্রতি দায়িত্বশীল হয় তখন উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেমন সম্ভব হয় তেমনি কম সময়ে সেবা প্রদানও সহজতর হয়।

উপসংহারে বলা যায়, সমন্বয়সাধনের অবর্তমানে কর্মীরা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বৃহত্তর পরিসরে তাদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হবে; বরং তারা প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যের পরিবর্তে নিজস্ব বিভাগীয় লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হবে। এরূপ অবস্থা প্রতিষ্ঠানের জন্য মঙ্গলজনক নয়।

সমন্বয়সাধনের প্রকারভেদ

Types of Coordination

সমন্বয়সাধন কত প্রকার হবে তা কতকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন- প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, আয়তন, কার্য বিভক্তির সংখ্যা, কার্যের জটিলতা, কারবার সংশ্লিষ্ট পক্ষের সংখ্যা ইত্যাদি। সমন্বয়সাধনের প্রকারভেদ বা শ্রেণিবিভাগ কোনো প্রতিষ্ঠানেরই সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তাকে ম্লান করে না। বরং কোনো কোনো সমন্বয়সাধন প্রক্রিয়া কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগের মাত্রা বৃদ্ধি করে। সমন্বয়সাধনকে প্রধানত দু'টি মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যথা- (১) অবস্থান এবং (২) পদ-মর্যাদা। অবস্থানগত দিক থেকে সমন্বয়সাধনকে প্রথমত, দু'ভাগে ভাগ করা হয়। (ক)

অভ্যন্তরীণ এবং (খ) বাহ্যিক সমন্বয়। অন্যদিকে পদ-মর্যাদার প্রকৃতি অনুসারে সমন্বয়সাধনকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হলোঃ (ক) সমান্তরাল (Horizontal), (খ) উল্লম্ব (Vertical)। উল্লম্ব সমন্বয়সাধনকে পুনরায় দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ (ক) নিম্নগামী (Downward) এবং (খ) ঊর্ধ্বগামী (Upward)। চিত্রটি দেখুন।

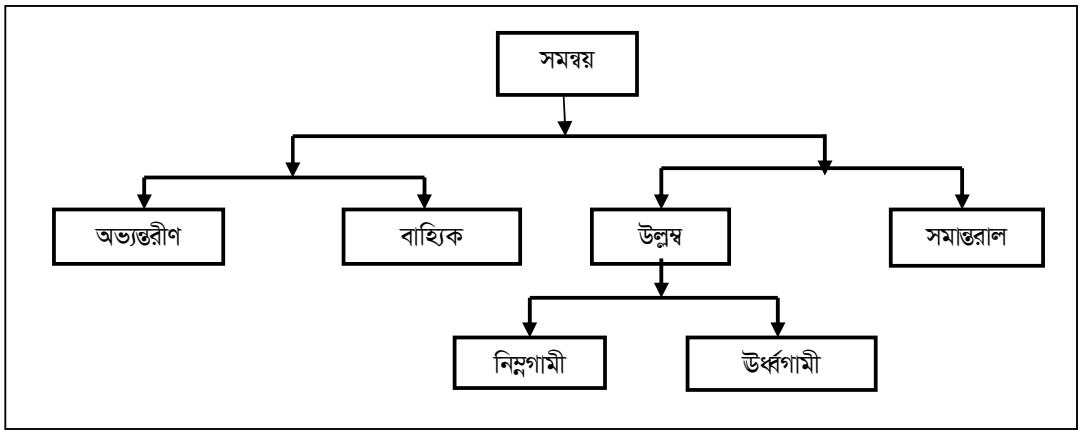

চিত্র: সমন্বয়সাধনের প্রকারভেদ

- **অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সাধনঃ** প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের বিভিন্ন বিভাগ, শাখা বা ইউনিটের মধ্যে সমন্বয় সাধনকে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় বলে। যেমন- উৎপাদন বিভাগের সাথে মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের সমন্বয়সাধন।

- **বাহ্যিক সমন্বয়সাধনঃ** সরকার, প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান, খরিদ্দার, বিক্রেতা, মধ্যস্থতাকারী এবং অন্যান্য বাহ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাথে স্থাপিত সমন্বয় এ শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। যেমন- সরকারের নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করা।

- **উল্লম্ব সমন্বয়সাধনঃ** উপর থেকে নিচে বা নিচ থেকে উপরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে স্থাপিত সমন্বয়সাধনকে এ পর্যায়ে ফেলা যায়। যেমন- ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে জেনারেল ম্যানেজার, তারপরে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার থেকে সহকারী জেনারেল ম্যানেজার এবং এভাবে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত সমন্বয় এ শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত।

- **নিম্নগামী সমন্বয়সাধনঃ** ব্যবস্থাপকের উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত নেমে আসা পরিকল্পনা, কৌশল, সিদ্ধান্ত প্রভৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে যে সমন্বয়সাধন গড়ে তোলা হয় সেটাই নিম্নগামী সমন্বয়সাধন। যেমন- ব্যাংকের একজন ম্যানেজার তার সহকারী ম্যানেজারগণ এবং কেরানি, ক্যাশিয়ার সবার সাথে যে সমন্বয়সাধন গড়ে তোলেন সেটাকে এ প্রকারের মধ্যে ফেলা যায়।

- **ঊর্ধ্বগামী সমন্বয়সাধনঃ** নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে উচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপক পর্যন্ত যে সহযোগিতার ধারা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে ঊর্ধ্বগামী সমন্বয়সাধন বলে। যেমন- সহকারী ম্যানেজারের সাথে ম্যানেজার বা আরো পরে জেনারেল ম্যানেজার এবং শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে সমন্বয় এ শ্রেণির মধ্যে পড়ে।

- **সমান্তরাল সমন্বয়সাধনঃ** একই স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে বলে সমান্তরাল সমন্বয়সাধন। যেমন- ক্রয় ব্যবস্থাপকের সাথে বিক্রয় ব্যবস্থাপকের সমন্বয় সাধন।

সমন্বয়সসাধনের কৌশলসমূহ
Cooordination Techniques

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য কতকগুলো কৌশল বা উপায় অবলম্বন করা হয়। Gilbreth সমন্বয়সাধনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ৫ টি কৌশলের কথা উল্লেখ করেছেনঃ

১. ব্যবস্থাপকীয় ধাপ কৌশল (The Managerial Hierarchy Technique)
২. বিধি এবং পদ্ধতি কৌশল (Rules & Procedures Technique)
৩. লিয়াজোঁ ভূমিকা কৌশল (Liaison Roles Technique)
৪. টাস্ক ফোর্স কৌশল (Task Forces Technique)
৫. সুসংবদ্ধ বিভাগ কৌশল (Integrating Departments Technique)

নিম্নে এগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১ . ব্যবস্থাপকীয় ধাপ কৌশল (The Managerial Hierarchy Techniques)ঃ সমন্বয়সাধনের একটি অন্যতম কৌশল হলো ব্যবস্থাপকীয় ধাপের ব্যবহার। এ ব্যবস্থায় আন্ত-নির্ভরশীল বিভাগ বা ইউনিটসমূহের (interdependent departments on units) দায়িত্বের একজন ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয়। তিনি এসব বিভাগ বা ইউনিটের মধ্যে সমন্বয়সাধনের কাজে লিপ্ত থাকেন। তিনি আন্তঃনির্ভরশীল বিভাগের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন করেন ও সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করেন। উদাহরস্বরূপ, ঢাকায় অবস্থিত একটি কুরিয়ার কোম্পানির প্রধান কাজ হলো গ্রাহকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত জিনিসপত্র (পার্সেল/প্যাকেট) গ্রহণ করা এবং প্রেরিতব্য প্যাকেটগুলো গাড়িতে উঠিয়ে দেয়া/প্লেনে পাঠানো। দু'টি শ্রেণির কাজই হলো পরস্পর নির্ভরশীল। ফলে এ দু'টো কাজের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন নিশ্চিত করার জন্য একজন ব্যবস্থাপককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে- দু'জনকে নয়।

২. বিধি এবং পদ্ধতি কৌশল (Rules and Proceduers Technique)ঃ সমন্বয়সাধনের আরেকটি কৌশল হলো বিধি ও মানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ। এ পদ্ধতিতে নৈমিত্তিক সমন্বয় কার্যাবলি (routine coordination activities) নির্দিষ্ট বিধি এবং মানসম্মত পদ্ধতির দ্বারা নির্বাহ (handle) করা হয়। নির্দিষ্ট কোন বিধি (rule) প্রয়োগ করে কোন কার্য পূর্বে সম্পাদিত হবে এবং কোন বিভাগের কার্য পরে সম্পাদিত হবে তা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। তবে এ ধরনের কৌশল শুধুমাত্র যেখানে রুটিন মোতাবেক কার্য সম্পাদিত হয় সেখানে প্রযোজ্য। জটিলতাপূর্ণ অবস্থায় এ কৌশল কার্যকরী হয় না।

৩. লিয়াজো ভূমিকা কৌশল (Liaison Roles Technique)ঃ যোগাযোগ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগ এবং ইউনিটের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা যায়। যোগাযোগ সমন্বয়কারী দুই বা ততোধিক আন্তঃনির্ভরশীল ইউনিটের মধ্যে সাধারণ চুক্তির (common point of contract) মাধ্যমে সমন্বয় করে থাকেন। এ ধরনের সমন্বয়কারীদের সাধারণভাবে বিভিন্ন দলের উপর কোন আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব নেই। তারা তথ্য প্রবাহে সহায়তা দিয়ে থাকে। যোগাযোগকারীগণ বিভিন্ন দল এবং সামগ্রিকভাবে পুরো প্রজেক্টের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে থাকে।

৪. টাস্ক ফোর্স কৌশল (Task Force Technique)ঃ যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে সমন্বয়সাধনের প্রয়োজন পড়ে তখন টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। আন্তঃনির্ভরশীলতা খুব জটিল হলে এবং যখন বিভিন্ন বিভাগ বা ইউনিটের সংখ্যা বেশি হয় তখন শুধুমাত্র একজন যোগাযোগকারী যথার্থ নয়। তখন একটি টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে যাতে প্রত্যেক দলের একজন করে প্রতিনিধি থাকে। এ অবস্থায় সমন্বয় একাধিক ব্যক্তির মধ্যে প্রসারিত হয়। কারণ প্রত্যেক দলের প্রতিনিধি তার দল সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত থাকেন। এতে করে সুষ্ঠু সমন্বয় সম্ভব হয়। টাস্ক ফোর্সের কার্য সমাপ্ত হলে সদস্যরা নিজেদের পদে পুনরায় ফিরে যান।

৫. সুসংবদ্ধ বিভাগ কৌশল (Integrating Departments Technique)ঃ এ কৌশলটি অনেকটা টাস্ক ফোর্সের মত কিন্তু অধিক স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারণত, সুসংবদ্ধ বা সমন্বিত বিভাগগুলোর কিছু স্থায়ী সদস্য থাকে। অন্যান্য ইউনিটগুলোর জন্য সমন্বয়ের দরকার হলে অস্থায়ীভাবে তাদের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ধরনের সুসংবদ্ধ বিভাগ অভ্যন্তরীণ সমন্বিতকরণ (integration) এবং সমন্বয়সাধনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ধরনের বিভাগের ক্ষমতা টাস্ক ফোর্সের চেয়ে অধিক হয়। এ ধরনের বিভাগকে বাজেটারী নিয়ন্ত্রণের কিছু ক্ষমতা দেয়া হয়ে থাকে। যখন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আন্তঃনির্ভরশীল মাত্রা অধিক হয় তখন সমন্বয়সাধনের দরকারও বেশি হয়।

যখন আন্তঃনির্ভরশীলতার মাত্রা কম বা স্বাভাবিক হয় তখন ব্যবস্থাপনা ধাপ কৌশল এবং বিধি ও পদ্ধতি কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যদিকে যখন অধিক মাত্রায় আন্তঃনির্ভরশীলতা দেখা দেয় ও জটিলতাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করে তখন টাস্ক কৌশল ও সুসংবদ্ধ বিভাগ কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উপকরণের একত্রিকরণের পর উৎপাদন বা সেবা প্রদান শুরু হলে এরপর বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয়সাধনের দরকার পড়ে। একক ও অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য যখন সকলের কার্যাবলি সম্পাদিত হতে থাকে তখন তাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কের কারণে প্রত্যেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদন করে পরবর্তী জনের কাছে প্রেরণ করে। এরূপ একটি সম্পর্ককে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে সমন্বয়সাধন বলা হয়। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের কার্যের মধ্যে সমন্বয় বা সামঞ্জস্যর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সমন্বয়সাধনের প্রক্রিয়া ব্যক্তিক বা দলীয় প্রচেষ্টাকে একীভূত এবং একসূত্রে গ্রথিত করে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে। সমন্বয়সাধন কত প্রকার হবে তা কতকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সমন্বয়সাধনকে প্রধানত দু'টি মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যথা- (১) অবস্থান এবং (২) পদ-মর্যাদা। অবস্থানগত দিক থেকে সমন্বয়সাধনকে প্রথমত, দু'ভাগে ভাগ করা হয়। (ক) অভ্যন্তরীণ এবং (খ) বাহ্যিক সমন্বয়। অন্যদিকে পদ-মর্যাদার প্রকৃতি অনুসারে সমন্বয়সাধনকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হলোঃ (ক) সমান্তরাল, (খ) উল্লম্ব। উল্লম্ব সমন্বয়সাধনকে পুনরায় দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ (ক) নিম্নগামী এবং (খ) ঊর্ধ্বগামী। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য কতকগুলো কৌশল বা উপায় অবলম্বন করা হয়, যেমন- ব্যবস্থাপকীয় ধাপ কৌশল, বিধি এবং পদ্ধতি কৌশল, লিয়াজোঁ ভূমিকা কৌশল, টাস্ক ফোর্স কৌশল এবং সুসংবদ্ধ বিভাগ কৌশল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. কার্য বিশেষীকরণের ধারণা এবং উৎপত্তি ব্যাখ্যা করুন।
২. বিভাগীকরণ কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানকে গতিময় করতে পারে? বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৩. বিভাগীকরণ কেন করা হয়? এর পদ্ধতিগুলো আলোচনা করুন।
৪. বিভাগীকরণের সময় একজন ব্যবস্থাপককে কি কি বিষয় বিবেচনায় রাখা উচিৎ?
৫. আদেশের শৃংখল কী? ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।
৬. আপনি কিভাবে একজন ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ণয় করবেন?
৭. তত্ত্বাবধান পরিসর কত প্রকারের? প্রত্যেক প্রকার তত্ত্বাবধান পরিসরের বর্ণনা দিন।
৮. তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ণয় করার জন্য গ্রেইকুনাস যে সূত্রটি উদ্ভাবন করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করুন।
৯. সংকীর্ণ ও বিস্তৃত তত্ত্বাবধান পরিসরের মধ্যে পার্থক্য কী?
১০. কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণকালে কি কি বিষয় আপনি বিবেচনায় রাখবেন? আলোচনা করুন।
১১. কী কারণে তত্ত্বাবধান পরিসর কাম্যস্তরে থাকা বাঞ্ছনীয়?
১২. সমন্বয়সাধন বলতে কী বুঝায়? সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
১৩. সমন্বয়সসাধনের কৌশলগুলো কী? উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।
১৪. প্রতিষ্ঠানে কত ধরনের সমন্বয় প্রক্রিয়া দেখা যায়? ব্যবস্থাপকীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করুন।